মাকড়সার রস

শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়

BENGALIEBOOK.COM ★2022★

সূচিপত্র

মাকড়সার রস – ০১ 2
মাকড়সার রস – ০২ 11
মাকড়সার রস – ০৩ 21

মাকড়সার রস – ০১

ব্যোমকেশকে এক রকম জোর করিয়াই বাড়ি হইতে বাহির করিয়াছিলাম।

গত একমাস ধরিয়া সে একটা জটিল জালিয়াতের তদন্তে মনোনিবেশ করিয়াছিল, একগাদা দলিল পত্র লইয়া রাতদিন তাহার ভিতর হইতে অপরাধীর অনুসন্ধানে ব্যাপৃত ছিল এবং রহস্য যতই ঘনীভূত হইতেছিল ততই তাহার কথাবার্তা কমিয়া আসিতেছিল। লাইব্রেরী ঘরে বসিয়া নিরন্তর এই শুষ্ক কাগজপত্রগুলো ঘাঁটিয়া তাহার শরীরও খারাপ হইয়া পড়িতেছে দেখিতেছিলাম, কিন্তু সে-কথার উল্লেখ করিলে সে বলিত,–"নাঃ, বেশ তো আছি–"

সেদিন বৈকালে বলিলাম–"আর তোমার কথা শোনা হবে না, চল একটু বেড়িয়ে আসা যাক। দিনের মধ্যে অন্তত দু'ঘণ্টাও তো বিশ্রাম দরকার।"

"কিন্তু–"

"কিন্তু নয়–চল লেকের দিকে। দু'ঘণ্টায় তোমার জালিয়াৎ পালিয়ে যাবে না।"

"চল–" কাগজপত্র সরাইয়া রাখিয়া সে বাহির হইলে বটে কিন্তু তাহার মনটা সেই অজ্ঞাত জালিয়াতের পিছু ছাড়ে নাই বুঝিতে কষ্ট হইল না।

লেকের ধারে বেড়াইতে বেড়াইতে হঠাৎ একজন বহু পুরাতন কলেজের বন্ধুর সঙ্গে দেখা হইয়া গেল। অনেকদিন তাহাকে দেখি নাই; আই. এ. ক্লাশে দু'জনে একসঙ্গে পড়িয়াছিলাম, তারপর সে মেডিকেল কলেজে প্রবেশ করে। সেই অবধি ছাড়াছাড়ি। আমি তাহাকে দেখিয়া বলিলাম–"আরে! মোহন যে! তুমি কোত্থেকে?"

সে আমাকে দেখিয়া সহর্ষে বলিল–"অজিত! তাই তো হে! কদ্দিন পরে দেখা! তারপর খবর কি?"

কিছুক্ষণ পরস্পরের পিঠ চাপড়া-চাপড়ির পর ব্যোমকেশের সহিত পরিচয় করিয়া দিলাম। মোহন বলিল–"আপনিই? বড় খুশি হলুম। মাঝে মাঝে সন্দেহ হত বটে, আপনার কীর্তি-প্রচারক অজিত বন্দ্যোপাধ্যায় হয়তো আমাদের বাল্যবন্ধু অজিত; কিন্তু বিশ্বাস হত না।"

জিজ্ঞাসা করিলাম–"তুমি আজকাল কি করছ?"

মোহন বলিল–"কলকাতাতেই প্রাক্‌টিস করছি।"

তারপর বেড়াইতে বেড়াইতে নানা কথায় ঘণ্টাখানেক কাটিয়া গেল। লক্ষ্য করিলাম, সাধারণ কথাবার্তার মধ্যে মোহন দু' একবার কি একটা বলিবার জন্য মুখ খুলিয়া আবার থামিয়া গেল। ব্যোমকেশও তাহা লক্ষ্য করিয়াছিল, তাই এক সময় অল্প হাসিয়া বলিল–"কি বলবেন বলুন না।"

মোহন একটু লজ্জিত হইয়া বলিল–"একটা কথা বলি-বলি করেও বলতে সঙ্কোচ হচ্ছে। ব্যাপারটা এত তুচ্ছ যে সে নিয়ে আপনাকে বিব্রত করা অন্যায়। অথচ–"

আমি বলিলাম–"তা হোক, বল। আর কিছু না হোক, ব্যোমকেশকে কিছুক্ষণের জন্য জালিয়াতের হাত থেকে নিষ্কৃতি দেওয়া তো হবে।"

"জালিয়াৎ?"

আমি বুঝাইয়া দিলাম। তখন মোহন বলিল–"ও! কিন্তু আমার কথা শুনে হয়তো ব্যোমকেশবাবু হাসবেন–"

ব্যোমকেশ বলিল–"হাসির কথা হলে নিশ্চয় হাসব, কিন্তু আপনার ভাব দেখে তা মনে হচ্ছে না। বরঞ্চ বোধ হচ্ছে একটা কোনও সমস্যা কিছুদিন থেকে আপনাকে ভাবিত করে রেখেছে–আপনি তারই উত্তর খুঁজছেন।"

মোহন সাগ্রহে কহিল–"আপনি ঠিক ধরেছেন। জিনিসটা হয়তো খুবই সহজ–কিন্তু আমার পক্ষে একটা দুর্ভেদ্য প্রহেলিকা হয়ে দাঁড়িয়েছে। আমি নেহাত বোকা নই–সাধারণ সহজ-বুদ্ধি আছে বলেই মনে করি; অথচ একজন রোগে পঙ্গু চলৎশক্তিরহিত লোক আমাকে প্রত্যহ এমনভাবে ঠকাচ্ছে যে শুনলে আশ্চর্য হয়ে যাবেন; শুধু আমাকে নয়, তার সমস্ত পরিবারের তীক্ষ্ণ সতর্কতা সে প্রতি মুহূর্তে ব্যর্থ করে দিচ্ছে।"

কথা কহিতে কহিতে আমরা একটা বেঞ্চিতে আসিয়া বসিয়াছিলাম। মোহন বলিল–"যতদূর সম্ভব সংক্ষেপে ব্যাপারটা বলছি–শুনুন। কোনো একটা বড় মানুষের বাড়িতে আমি গৃহ-চিকিৎসক। তাঁরা বনেদী বড়মানুষ, কলকাতায় বন কেটে বাস; অন্যান্য বিষয় সম্পত্তি ছাড়াও কলকাতায় একটা বাজার আছে–তা থেকে মাসিক হাজার পনের টাকা আয়। সুতরাং আর্থিক অবস্থা কি রকম বুঝতেই পারছেন।

"এই বাড়ির যিনি কর্তা তাঁর নাম নন্দদুলালবাবু। ইনিই বলতে গেলে ও বাড়িতে আমার একমাত্র রুগী। বয়স কালে ইনি এত বেশি বদ-খেয়ালী করেছিলেন যে পঞ্চাশ বছর বয়স হতে না হতেই শরীর একেবারে ভেঙে পড়েছে। বাতে পঙ্গু, আরো কত রকম ব্যাধি যে তাঁর শরীরকে আশ্রয় করে আছে তা গুণে শেষ করা যায় না। তাছাড়া পক্ষাঘাতের লক্ষণও ক্রমে দেখা দিচ্ছে। আমাদের ডাক্তারি শাস্ত্রে একটা কথা আছে,–মানুষের মৃত্যুতে বিস্মিত হবার কিছু নেই, মানুষে যে বেঁচে থাকে এইটেই সবচেয়ে আশ্চর্যের বিষয়। আমার এই রুগীটিকে দেখলে সেই কথাই সর্বাগ্রে মনে পড়ে।

"এই নন্দদুলালবাবুর চরিত্র আপনাকে কি করে বোঝাব ভেবে পাচ্ছি না। কটুভাষী, সন্দিগ্ধ, কুটিল, হিংসাপরায়ণ–এক কথায় এমন ইতর নীচ স্বভাব আমি আর কখনো দেখিনি। বাড়িতে স্ত্রী পুত্র পরিবার সব আছে কিন্তু কারুর সঙ্গে সদ্ভাব নেই। তাঁর ইচ্ছা যৌবনে যে উচ্ছৃঙ্খলতা করে বেড়িয়েছেন এখনো তাই করে বেড়ান। কিন্তু প্রকৃতি বাদ সেধেছেন, শরীরে সে সামর্থ্য নেই। এই জন্য পৃথিবীসুদ্ধ লোকের ওপর দারুণ রাগ আর ঈর্ষা–যেন তাঁর এই অবস্থার জন্য তারাই দায়ী। সর্বদা ছল খুঁজে বেড়াচ্ছেন কি করে কাকে জব্দ করবেন।

"শরীরের শক্তি নেই, বুকের গোলমালও আছে–তাই ঘর ছেড়ে বেরুতে পারেন না, নিজের ঘরে বসে বসে কেবল বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের ওপর কদর্য গালাগাল বর্ষণ করছেন, আর দিস্তে দিস্তে কাগজে অনবরত লিখে চলেছেন। তাঁর এক খেয়াল যে তিনি একজন অদ্বিতীয় সাহিত্যিক; তাই কখনো লাল কালিতে কখনো কালো কালিতে এন্তার লিখে যাচ্ছেন। সম্পাদকের ওপর ভয়ঙ্কর রাগ, তাঁর বিশ্বাস সম্পাদকেরা কেবল শত্রুতা করেই তাঁর লেখা ছাপে না।"

আমি কৌতূহলী হইয়া জিজ্ঞাসা করিলাম–"কি লেখেন?"

"গল্প। কিম্বা আত্ম-চরিতও হতে পারে। একবার মাত্র সে-লেখার ওপর আমি চোখ বুলিয়েছিলুম, তারপর আর সেদিকে তাকাতে পারিনি। সে-লেখা পড়বার পর গঙ্গাস্নান করলেও মন পবিত্র হয় না। আজকালকার যাঁরা তরুন লেখক, সে-গল্প পড়লে তাঁদেরও বোধ করি দাঁত কপাটি লেগে যাবে।"

ব্যোমকেশ ঈষৎ হাসিয়া বলিল–"চরিত্রটি যেন চোখের সামনে দেখতে পাচ্ছি। কিন্তু সমস্যাটি কি?"

মোহন আমাদের দু'জনকে দুটি সিগারেট দিয়া, একটি নিজে ধরাইয়া বলিল–"আপনারা ভাবছেন এমন গুণবান লোকের আর কোনো গুণ থাকা সম্ভব নয়–কেমন? কিন্তু তা নয়। এঁর আর একটি মস্ত গুণ আছে, এই শরীরের ওপর উনি এক অদ্ভুত নেশা করেন।"

সিগারেটে গোটা দুই টান দিয়া বলিল–"ব্যোমকেশবাবু, আপনি তো এই কাজের কাজের, সমাজের নিকৃষ্ট লোক নিয়েই আপনাকে কারবার করতে হয়, মদ গাঁজা চণ্ডু কোকেন ইত্যাদি অনেক রকম নেশাই মানুষকে করতে দেখে থাকবেন;–কিন্তু মাকড়সার রস খেয়ে কাউকে নেশা করতে দেখেছেন কি?"

আমি আঁৎকাইয়া উঠিয়া বলিলাম–"মাকড়সার রস! সে আবার কি?"

মোহন বলিল–"এক জাতীয় মাকড়সার রস আছে, যার শরীর থেকে এই বীভৎস বিষাক্ত রস পিষে বার করে নেওয়া হয়–"

ব্যোমকেশ কতকটা আত্মগতভাবে বলিল–"Tarantula Dance! স্পেনে আগে ছিল–এই মাকড়সার কামড় খেয়ে লোকে হরদম নাচত! দারুণ বিষ! বইয়ে পড়েছি বটে কিন্তু এদেশে কাউকে ব্যবহার করতে দেখিনি।"

মোহন বলিল–"ঠিক বলেছেন–ট্যারাণ্টুলা; সাউথ আমেরিকার স্পানিশ সঙ্কর জাতির মধ্যে এই নেশার খুব বেশি চলন আছে। এই ট্যারাণ্টুলার রস একটা তীব্র বিষ, কিন্তু খুব মাত্রায় ব্যবহার করলে শরীরের স্নায়ুমণ্ডলে একটা প্রবল উত্তেজনা সৃষ্টি করে। বুঝতেই পারছেন, স্বভাবের দোষে স্নায়ুবিক উত্তেজনা না হলে যারা থাকতে পারে না তাদের পক্ষে এই মাকড়সার রস কি রকম লোভনীয় বস্তু। কিন্তু নিয়মিত ব্যবহার করলে এর ফল সাংঘাতিক হয়ে দাঁড়ায়। অস্বাভাবিক পক্ষাঘাতে মৃত্যু অনিবার্য।

"আমাদের নন্দদুলালবাবু বোধহয় যৌবনকালে এই চমৎকার নেশাটি ধরেছিলেন; তারপর শরীর যখন অকর্মণ্য হয়ে পড়ল তখনো নেশা ছাড়তে পারলেন না। আমি যখন গৃহ-

চিকিৎসক হয়ে ওঁদের বাড়িতে ঢুকলুম তখনো উনি প্রকাশ্যে ঐ নেশা চালাচ্ছেন, সে আজ বছরখানেকের কথা। আমি প্রথমেই ওটা বন্ধ করে দিলুম–বললুম, যদি বাঁচতে চান তাহলে ওটা ছাড়তে হবে।

“এই নিয়ে খুব খানিকটা ধস্তাধস্তি হল, তিনিও খাবেনই আমিও খেতে দেব না। শেষে আমি বললুম–“আপনার বাড়িতে ও জিনিস ঢুকতে দেব না, দেখি আপনি কি করে খান।” তিনিও কুটিল হেসে বললেন–“তাই নাকি? আচ্ছা, আমিও খাব, দেখি তুমি কি করে আটকাও।” যুদ্ধ ঘোষণা হয়ে গেল।

“পরিবারের আর সকলে আমার পক্ষে ছিলেন, সুতরাং সহজেই বাড়ির চারিদিকে কড়া পাহারা বসিয়ে দেওয়া গেল। তাঁর স্ত্রী ছেলেরা পালা করে তাঁকে পাহাড়া দিতে লাগলেন, যাতে কোনোক্রমে সে-বিষ তাঁর কাছে পৌঁছতে না পারে। তিনি নিজে একরকম চলৎশক্তিহীন, বাড়ি থেকে বেরিয়ে যে সে-জিনিস সংগ্রহ করবেন সে ক্ষমতা নেই। আমি এইভাবে তাঁকে আগ্‌লাবার ব্যবস্থা করে দিয়ে বেশ একটু আত্মপ্রসাদ অনুভব করতে লাগলুম।

“কিন্তু কিছুতেই কিছু হল না। এত কড়াকড়ি সত্ত্বেও বাড়িসুদ্ধ লোকের নজর এগিয়ে তিনি নেশা করতে লাগলেন; কোথা থেকে সে জিনিস আমদানি করেছেন কেউ ধরতে পারলুম না।

“প্রথমটা আমার সন্দেহ হল, হয়তো বাড়ির কেউ লুকিয়ে তাঁকে সাহায্য করছে। তাই একদিন আমি নিজে সমস্ত দিন পাহারায় রইলুম। কিন্তু আশ্চর্য মশায়, আমার চোখের সামনে তিন তিনবার সেই বিষ খেলেন। তাঁর নাড়ি দেখে বুঝলুম–অথচ কখন খেলেন ধরতে পারলুম না।

"তারপর তাঁর ঘর আঁতিপাঁতি করেছি, তাঁর সঙ্গে বাইরের লোকের দেখা করা একেবারে বন্ধ করে দিয়েছি, কিন্তু তবু তাঁর মৌতাত বন্ধ করতে পারিনি। এখনো সমভাবে সেই ব্যাপার চলছে।

"এখন আমার সমস্যা হয়ে দাঁড়িয়েছে এই যে, লোকটা ঐ মাকড়সার রস পায় কোথা থেকে এবং পেলেও সকলের চোখে ধুলো দিয়ে খায় কি করে!"

মোহন চুপ করিল। ব্যোমকেশ শুনিতে শুনিতে অন্যমনস্ক হইয়া পড়িয়াছিল কিনা বলিতে পারি না, মোহন শেষ করিতেই সে উঠিয়া দাঁড়াইয়া বলিল–"অজিত, বাড়ি চল। একটা কথা হঠাৎ মাথায় এসেছে, যদি তা ঠিক হয় তাহলে–"

বুঝিলাম সেই পুরানো জালিয়াৎ আবার তাহাকে চাপিয়া ধরিয়াছে। মোহন এতক্ষণ যে বকিয়া গেল তাহার শেষের দিকের কথাগুলো হয়তো তাহার কানেও যায় নাই। আমি একটু অপ্রতিভভাবে বলিলাম–"মোহনের গল্পটা বোধহয় তুমি ভাল করে শোনেনি–"

"বিলক্ষণ! শুনেছি বৈকি। সমস্যাটা খুব মজার–কৌতূহলও হচ্ছে–কিন্তু এখন কি আমার সময় হবে? আমি একটা বিশেষ শক্ত কাজে–"

মোহন মনে মনে বোধহয় একটু ক্ষুণ্ণ হইল, কিন্তু সে ভাব গোপন করিয়া বলিল–"তবে কাজ নেই–থাক। আপনাকে এইসব তুচ্ছ ব্যাপারে মাথা ঘামাতে অনুরোধ করা অবশ্য অনুচিত; কিন্তু–কি জানেন, এর একটা নিষ্পত্তি হলে হয়তো লোকটার প্রাণ বাঁচাতে পারা যেত। একটি লোক–যতবড় পাপিষ্ঠই হোক–বিন্দু বিন্দু বিষ খেতে আত্মহত্যা করছে চোখের সামনে দেখছি অথচ নিবারণ করতে পারছি না, এর চেয়ে দুঃখের বিষয় আর কি হতে পারে?"

ব্যোমকেশ একটু লজ্জিত হইয়া বলিল–"আমি করব না বলিনি তো। এ ধাঁধার উত্তর পেতে হলে ঘণ্টা দু'য়েক ভাবতে হবে; আর, একবার লোকটিকে দেখলেও ভাল হয়–কিন্তু

আজ বোধহয় তা পেরে উঠব না। নন্দদুলালবাবুর মত অসামান্য লোককে কিছুতেই মরতে দেওয়া যেতে পারে না। সে আমি দেবোও না–আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন। কিন্তু এখনি আমার বাসায় ফিরতে হচ্ছে। মনে হচ্ছে জালিয়াৎ লোকটাকে ধরে ফেলেছি। কিন্তু একবার কাগজগুলো ভাল করে দেখা দরকার। –সুতরাং আজকের রাতটা নন্দদুলালবাবু নিশ্চিন্ত মনে বিষ পান করে নিন–কাল থেকে আমি তাঁকে জব্দ করে দেব।"

মোহন হাসিয়া বলিল–"বেশ, কালই হবে। কখন আপনার সুবিধা হবে বলুন–আমি 'কার' পাঠিয়ে দেব।"

ব্যোমকেশ একটু চিন্তা করিয়া বলিল–"আচ্ছা, এক কাজ করা যাক, তাতে আপনার উৎকণ্ঠাও অনেকটা লাঘব হবে। অজিত আজ আপনার সঙ্গে গিয়ে দেখেশুনে আসুক; তারপর ওর মুখে সব কথা শুনে আজ রাত্রেই কিম্বা কাল সকালে আমি আপনার ধাঁধার উত্তর দিয়ে দেব।"

ব্যোমকেশের বদলে আমি যাইব, ইহাতে মোহনের মুখে যে নিরাশার ভাব ফুটিয়া উঠল তাহা কাহারো চক্ষু এড়াইবার নয়। ব্যোমকেশ তাহা দেখিয়া হাসিয়া বলিল–"আপনার বাল্যবন্ধু বলেই বোধহয় অজিতের ওপর আপনার তেমন–ইয়ে–নেই। কিন্তু হতাশ হবেন না, সৎসঙ্গে পড়ে ওর বুদ্ধি এখন এমনি ভীষণ তীক্ষ্ণ হয়ে উঠেছে যে তার দু' একটা দৃষ্টান্ত শুনলে আপনি অবাক হয়ে যাবেন। –হয়তো ও নিজেই আপনার এই ব্যাপারে সমস্ত রহস্য উদ্ঘাটিত করে দেবে, আমাকে দরকারও হবে না।"

এতবড় সুপারিশেও মোহন বিন্দুমাত্র উৎসাহিত হইল না। রুই কাৎলা ধরিবার আশায় ছিপ ফেলিয়া যাহারা সন্ধ্যাকালে পুঁটিমাছ ধরিয়া গৃহে প্রত্যাবর্তন করে তাহাদের মত মুখভার করিয়া সে বলিল–"অজিতই চলুক তাহলে। কিন্তু ও যদি না পারে–"

"হ্যাঁ হ্যাঁ, সে আর বলতে! তখন তো আমি আছিই।" ব্যোমকেশ আমাকে আড়ালে ডাকিয়া বলিল–"সব জিনিস ভাল করে লক্ষ্য কোরো, আর চিঠিপত্র কি আসে খোঁজ নিও।"–এই বলিয়া সে প্রস্থান করিল।

মাকড়সার রস – ০২

ব্যোমকেশকে অনেক জটিল রহস্যের মর্মোদ্ঘাটন করিতে দেখিয়াছি ও তাহাতে সাহায্য করিয়াছি। তাহার অনুসন্ধান পদ্ধতিও এতদিন একসঙ্গে থাকিয়া অনেকটা আয়ত্ত হইয়াছে। তাই মনে মনে ভাবিলাম, এই সামান্য ব্যাপারের কিনারা করিতে পারিব না? বিশেষ, আমার প্রতি মোহনের বিশ্বাসের অভাব দেখিয়া ভিতরে ভিতরে একটা জিদও চাপিয়াছিল, যেমন করিয়া পারি এ ব্যাপারের নিষ্পত্তি করিব।

মনে মনে এইরূপ সঙ্কল্প আঁটিয়া মোহনের সহিত লেক হইতে বাহির হইলাম। বাস আরোহণে যখন নির্দিষ্ট স্থানের নিকট উপস্থিত হইলাম তখন সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হইয়া গিয়াছে–রাস্তার গ্যাস জ্বলিয়া উঠিতেছে। মোহন পথ দেখাইয়া লইয়া চলিল। সার্কুলার রোড হইতে একটা গলি ধরিয়া কিছুদূর অগ্রসর হইবার পর সম্মুখে একটা লোহার রেলিংযুক্ত বড় বাড়ি দেখাইয়া মোহন বলিল–"এই বাড়ি।"

দেখিলাম সেকেলে ধরনের পুরাতন বাড়ি, সম্মুখে লোহার ফটকে টুল পাতিয়া দারোয়ান বসিয়া আছে। মোহনকে দেখিয়া সেলাম করিয়া পথ ছাড়িয়া দিল, কিন্তু আমার প্রতি সন্দিগ্ধ দৃষ্টিপাত করিয়া বলিল–"বাবুজি, আপকো ভিতর যানা–"

মোহন হাসিয়া বলিল–"ভয় নেই দারোয়ান, উনি আমার বন্ধু।"

"বহুত খুব"–দারোয়ান সরিয়া দাঁড়াইল; আমরা বাড়ির সম্মুখস্থ অঙ্গনে প্রবেশ করিলাম। অঙ্গন পার হইয়া বারান্দায় উঠিতেই ভিতর হইতে একটা বিশ-বাইশ বছরের যুবক বাহির হইয়া আসিল–"কে, ডাক্তারবাবু? আসুন।" আমার দিকে সপ্রশ্ন নেত্রে চাহিয়া জিজ্ঞাসা করিল–"ইনি–?"

মোহন তাহাকে একটু তফাতে লইয়া গিয়া নিম্নকণ্ঠে কি বলিল, যুবকও উত্তর দিল–"বেশ তো, বেশ তো, উনি আসুন না–"

মোহন তখন পরিচয় করাইয়া দিল–গৃহস্বামীর জ্যেষ্ঠপুত্র, নাম অরুণ। তাহার অনুবর্তী হইয়া আমরা বাড়ির ভিতর প্রবেশ করিলাম। দুইটা ঘর অতিক্রম করিয়া তৃতীয় ঘরের বন্ধ দরজায় করাঘাত করিতেই ভিতর হইতে একটা কহল-তীক্ষ্ণ ভাঙা কণ্ঠস্বর শুনা গেল–"কে? কে তুমি? এখন আমায় বিরক্ত করো না, আমি লিখছি।"

অরুণ বলিল–"বাবা, ডাক্তারবাবু এসেছেন। অভয়, দোর খোল।" একটি আঠারো-উনিশ বছর বয়সের যুবক–বোধহয় গৃহস্বামীর দ্বিতীয় পুত্র–দ্বার খুলিয়া দিল। আমরা সকলে ঘরে প্রবেশ করিলাম।

অরুণ চুপিচুপি অভয়কে জিজ্ঞাসা করিল–"খেয়েছেন?"

অভয় ম্লানভাবে ঘাড় নাড়িল।

ঘরে ঢুকিয়াই প্রথমে দৃষ্টি পড়িল, ঘরের মধ্যস্থলে ঘাটের উপর বিছানা পাতা রহিয়াছে এবং সেই বিছানায় বালিশে ঠেস দিয়া বসিয়া, ডান হাতে উখিত কলম ধরিয়া, অতি শীর্ণকায় নন্দদুলালবাবু ক্রুদ্ধ কষায়িত নেত্রে আমাদের দিকে চাহিয়া আছেন। মাথার উপর উজ্জ্বল বৈদ্যুতিক আলো জ্বলিতেছিল, আর একটা টেবিল-ল্যাম্প ঘাটের ধারে উঁচু টিপাইয়ের উপর রাখা ছিল; তাই লোকটির সমস্ত অবয়ব ভাল করিয়া দেখিতে পাইলাম। তাঁহার বয়স বোধ করি পঞ্চাশের নীচেই কিন্তু মাথার চুল সমস্ত পাকিয়া একটা শ্রীহীন পাঁশুটে বর্ণ ধারণ করিয়াছে। হাড় চওড়া, ধারালো মুখে মাংসের লেশমাত্র নাই, হনুর অস্থি দু'টা যেন চর্ম ভেদ করিয়া বাহির হইয়াবার উপক্রম করিতেছে–পাৎলা দ্বিধা-ভগ্ন নাকটা মুখের উপর গৃধ্রের মত ঝুলিয়া পড়িয়াছে। চোখ দু'টা কোনো অস্বাভাবিক উত্তেজনার ফলে অত্যন্ত উজ্জ্বল হইয়া উঠিয়াছে। কিন্তু উত্তেজনার অবসানে আবার যে

তাহারা মৎস্যচক্ষুর মত ভাবলেশহীন হইয়া পড়িবে তাহার আভাসও সে-চক্ষে লুক্কায়িত আছে। নিম্নের ঠোঁট শিথিল হইয়া ঝুলিয়া পড়িয়াছে। সব মিলিয়া মুখের উপর একটা কদাকার ক্ষুধিত অসন্তোষ যেন রেখায় রেখায় চিহ্নিত হইয়া আছে।

কিছুক্ষণ এই প্রেতাকৃতি লোকটির দিকে বিস্মিতভাবে চাহিয়া থাকিয়া দেখিলাম, তাঁহার বাঁ হাতটা থাকিয়া থাকিয়া অকারণে আনর্তিত হইয়া উঠিতেছে, যেন সেটা স্বাধীনভাবে, দেহ হইতে সম্পূর্ণ বিযুক্ত হইয়া নৃত্য শুরু করিয়া দিয়াছে। মৃত ব্যাঙের দেহ তড়িৎ সংস্পর্শে চমকাইয়া উঠিতে যাঁহারা দেখিয়াছে, তাঁহারা এই স্নায়ু-নৃত্য কতকটা আন্দাজ করিতে পারিবেন।

নন্দদুলালবাবুও বিষদৃষ্টিতে আমার দিকে তাকাইয়া ছিলেন, সেই ভাঙা অথচ তীব্র স্বরে বলিয়া উঠিলেন–'ডাক্তার! এ আবার কাকে নিয়ে এসেছ এখানে? কি চায় লোকটা? যেতে বল–যেতে বল–"

মোহন চোখের একটা ইশারা করিয়া আমাকে জানাইলা যে আমি যেন গৃহস্বামীর এরূপ সম্ভাষণে কিছু মনে না করি; তারপর শয্যার উপর হইতে বিক্ষিপ্ত কাগজগুলো সরাইয়া শয্যাপার্শ্বে রাখিয়া রোগীর নাড়ি হাতে লইয়া স্থির হইয়া দেখিতে লাগিল। নন্দদুলালবাবু মুখে একটা বিকৃত হাস্য লইয়া একবার আমার পানে একবার ডাক্তারের পানে তাকাইতে লাগিলেন। বাঁ হাতটা তেমনি নৃত্য করিতে লাগিল।

শেষে হাত ছাড়িয়া দিয়া মোহন বলিল–"আবার খেয়েছেন?"

"বেশ করেছি খেয়েছে–কার বাবার কি?"

মোহন অধর দংশন করিল, তারপর বলিল–"এতে নিজেরই কেবল ক্ষতি করছেন। আর কারু নয়। কিন্তু সে তো আপনি বুঝবেন না, বোঝবার ক্ষমতাই নেই। ঐ বিষ খেয়ে খেয়ে মস্তিষ্কের দফা রফা করে ফেলেছেন।"

নন্দদুলালবাবু মুখের একটা পৈশাচিক বিকৃতি করিয়া বলিলেন–“তাই নাকি এয়ার? মস্তিষ্কের দফা রফা করে ফেলেছি? কিন্তু তোমার ঘটে তো অনেক বুদ্ধি আছে? তবে ধরতে পারছ না কেন? বলি, চারিদিকে তো সেপাই বসিয়ে দিয়েছ–কই, ধরতে পারলে না?” বলিয়া হি হি করিয়া এক অশ্রাব্য হাসি হাসিতে লাগিলেন।

মোহন বিরক্তভাবে উঠিয়া দাঁড়াইয়া বলিল–“আপনার সঙ্গে কথা কওয়াই ঝকমারি। যা করছিলেন করুন।”

নন্দদুলালবাবু পূর্ববৎ হি-হি করিয়া হাসিতে হাসিতে বলিলেন–“দুয়ো ডাক্তার, দুয়ো। আমায় ধরতে পারলে না, ধিনতা ধিনা পাকা নোনা–” সঙ্গে সঙ্গে দুই হাতের বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ তুলিয়া নাড়িতে লাগিলেন।

নিজের পুত্রদের সম্মুখে এই কদর্য অসভ্যতা আমার অসহ্য বোধ হইতে লাগিল; মোহনেরও বোধ করি ধৈর্যের বন্ধন ছিঁড়িবার উপক্রম করিতেছিল, সে আমাকে বলিল– “নাও অজিত, কি দেখবে দেখেশুনে নাও–আর পারা যায় না।”

হঠাৎ বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ আস্ফালন থামাইয়া নন্দদুলালবাবু দুই সর্প-চক্ষু আমার দিকে ফিরাইয়া কটুকণ্ঠে কহিলেন–“কে হে তুমি–আমার বাড়িতে কোন্ মতলবে ঢুকেছ?” আমি কোন জবাব দিলাম না, তখন–“চালাকি করবার আর জায়গা পাওনি? ওসব ফন্দি ফিকির এখানে চলবে না যাদু–বুঝেছ? এইবেলা চটপট সড়ে পড়, নইল পুলিস ডাকব। যত নচ্ছার ছিঁচকে চোরের দল।” বলিয়া মোহনকেও নিজের দৃষ্টির মধ্যে সাপটাইয়া লইলেন। সে আমাকে কি উদ্দেশ্যে আনিয়াছে ঠিক না বুঝিলেও আমার উপর তাঁহার ঘোর সন্দেহ জন্মিয়াছিল।

অরুণ লজ্জিতভাবে আমার কানে কানে বলিল–“ওঁর কথায় কান দেবেন না। ওটা খেলে ওঁর আর জ্ঞান বুদ্ধি থাকে না।”

মনে মনে ভাবিলাম, কি ভয়ঙ্কর এই বিষ যাহা মানুষের সমস্ত গোপন দুষ্প্রবৃত্তিকে এমন উগ্র প্রকট করিয়া তোলে! যে ব্যক্তি জানিয়া শুনিয়া ইহা খায় তাহার নৈতিক অধোগতির মাত্রাই বা কে নিরূপণ করিবে?

ব্যোমকেশ বলিয়াছিল সব দিক ভাল করিয়া লক্ষ্য করিতে, তাই যতদূর সম্ভব তাড়াতাড়ি ঘরের চতুর্দিক ঘুরিয়া ঘুরিয়া দেখিয়া লইলাম। ঘরটা বেশ বড়, আসবাবপত্রও অধিক নাই–একটা খাট, গোটা দুই দিন চেয়ার, একটা আলমারি ও একটা তেপায়া টেবিল। এই টেবিলের উপর ল্যাম্পটা রাখা আছে এবং তাহারি পাশে কয়েক দিস্তা অলিখিত কাগজ ও অন্যান্য লেখার সরঞ্জাম রহিয়াছে। লিখিত কাগজপত্রগুলো অবিন্যস্তভাবে চারিদিকে ছড়ানো। আমি একটা কাগজ তুলিয়া লইয়া কয়েক ছত্র পড়িয়াই শিহরিয়া রাখিয়া দিলাম;–মোহন যাহা বলিয়াছিল তাহা সত্য। এ লেখা পড়িলে ফরাসী বস্তুতান্ত্রিক এমিল জোলারও বোধ করি গা ঘিন্ ঘিন্ করিত। শুধু তাই নয়, লেখার বিশেষ রসালো স্থলগুলিতে লাল কালির দাগ দিয়ে লেখক মহাশয় সেইদিকে দৃষ্টি আকর্ষণের ব্যবস্থা করিয়া দিয়াছেন। বস্তুত, এতখানি নোংরা জঘন্য মনের পরিচয় আর কোথাও পাইয়াছি বলিয়া স্মরণ হইল না।

নন্দদুলালবাবুর দিকে একটা ঘৃণাপূর্ণ দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া দেখিলাম, তিনি আবার লেখায় মন দিয়াছেন। পার্কারের কলম দ্রুতবেগে কাগজের উপর সঞ্চরণ করিয়া চলিয়াছে, পাশের টেবিলে দোয়াতদানিতে আর একটা মেটে লাল রঙের পার্কারের ফাউণ্টেন পেন রাখা আছে, লেখা শেষ হইলেই বোধ করি দাগ দেওয়া আরম্ভ হইবে।

হইলও তাই। পাতাটা শেষ হইতেই নন্দদুলালবাবু কালো কলম রাখিয়া লাল কলমটা তুলিয়া লইলেন। আঁচড় কাটিয়া দেখিলেন, কালি ফুরাইয়া গিয়াছে–তখন টেবিলের উপর

হইতে লাল কালির চ্যাপ্টা শিশি লইয়া তাহাতে কালি ভরিলেন, তারপর গম্ভীরভাবে নিজের লেখার মণিমুক্তাগুলি চিহ্নিত করিতে লাগিলেন।

আমি মুখ ফিরাইয়া লইয়া ঘরের অন্যান্য জিনিস দেখিতে লাগিলাম। আলমারিটাতে কিছু ছিল না, শুধু কতকগুলো অর্ধেক ঔষধের শিশি পড়িয়াছিল। মোহন বলিল, সেগুলো তাহারই প্রদত্ত ঔষধ। ঘরে দু'টি জানালা, দু'টি দরজা। একটি দরজা দিয়া আমরা প্রবেশ করিয়াছিলাম, অন্যটি সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করিয়া জানিলাম, ওদিকে স্নানের ঘর ইত্যাদি আছে। সে ঘরটাও দেখিলাম; বিশেষ কিছু নাই, কয়েকতা কাচা কাপড় তোয়ালে তেল সাবান মাজন ইত্যাদি রহিয়াছে।

জানাল দু'টা সম্বন্ধে অনুসন্ধান করিয়া জানা গেল, বাহিরের সহিত উহাদের কোনো যোগ নাই, তাছাড়া অধিকাংশ সময়ই বন্ধ থাকে। ব্যোমকেশ থাকিলে কি ভাবে অনুসন্ধান করিত তাহা কল্পনা করিবার চেষ্টা করিলাম কিন্তু কিছুই ভাবিয়া পাইলাম না। দেয়ালে টোকা মারিয়া দেখিব কি না ভাবিতেছি–হয়তো কোথাও গুপ্ত দরজা আছে–এমন সময় চোখে পড়িল দেয়ালে একটা তাকের উপর একটা চাঁদির আরতদানি রহিয়াছে। সাগ্রহে সেটাকে পরীক্ষা করিলাম; তাহার মধ্যে খানিকটা তুলা ও খোপে খোপে আতর রহিয়াছে। চুপি চুপি অরুণকে জিজ্ঞাসা করিলাম–"উনি আরত মাখেন নাকি?"

সে অনিশ্চতভাবে মাথা নাড়িয়া বলিল–"কি জানি। বোধহয় না; মাখলে তো গন্ধ পাওয়া যেত।"

"এটা কতদিন এঘরে আছে?"

তা বরাবরই আছে। বাবাই ওটা আনিতে ঘরে রেখেছিলেন।"

ঘাড় ফিরাইয়া দেখিলাম, লেখা বন্ধ করিয়া নন্দদুলালবাবু এই দিকেই তাকাইয়া আছেন। মন উত্তেজিত হইয়া উঠিল; খানিকটা তুলা আতরে ভিজাইয়া পকেটে পরিয়া লইলাম।

তারপর ঘরের চারিদিকে একবার শেষ দৃষ্টিপাত করিয়া বাহির হইয়া আসিলাম। নন্দদুলালবাবুর দৃষ্টি আমাকে অনুসরণ করিল; দেখিলাম তাঁহার মুখে সেই শ্লেষপূর্ণ কদর্য হাসিটা লাগিয়া আছে।

বাহিরে আসিয়া আমরা বারান্দায় বসিলাম। আমি বলিলাম–“এখন আপনাদের কয়েকটা প্রশ্ন করিতে চাই, কোনো কথা গোপন না করে উত্তর দেবেন।”

অরুণ বলিল–“বেশ, জিজ্ঞাসা করুন।”

আমি বলিলাম–“আপনারা ওঁকে সর্বদা নজরবন্দীতে রেখেছেন? কে কে পাহারা দেয়?”

“আমি, অভয় আর মা পালা করে ওঁর কাছে থাকি। চাকর-বাকর বা অন্য কাউকে কাছে যেতে দিই না।”

“ওঁকে কখনও ও জিনিস খেতে দেখেছেন?”

“না–মুখে দিতে দেখিনি। তবে খেয়েছেন তা জানতে পেরেছি।”

“জিনিসটার চেহারা কি রকম কেউ দেখেছেন?”

“যখন প্রকাশ্যে খেতেন তখন দেখেছিলুম–জলের মত জিনিস, হোমিওপ্যাথিক শিশিতে থাকত; তাই কয়েক ফোঁটা সরবৎ কিম্বা অন্য কিছুর সঙ্গে মিশিয়ে খেতেন।”

“সে রকম শিশি ঘরে কোথাও নেই–ঠিক জানেন?”

“ঠিক জানি। আমরা তন্ন তন্ন করে খুঁজেছি।”

“তাহলে নিশ্চয় বাইরে থেকে আসে। কে আনে?”

অরুণ মাথা নাড়িল–“জানি না।”

“আপনারা তিনজন ছাড়া আর কেউ ও-ঘরে ঢোকে না? ভাল করে ভেবে দেখুন।”

“না–কেউ না। এক ডাক্তারবাবু ছাড়া।”

আমার জেরা ফুরাইয়া গেল–আর কি জিজ্ঞাসা করিব? গালে হাত দিয়া ভাবিতে ভাবিতে ব্যোমকেশের উপদেশ স্মরণ হইল; পুনশ্চ আরম্ভ করিলাম–"ওঁর কাছে কোনো চিঠিপত্র আসে?"

"না।"

"কোনো পার্সেল কি অন্য রকম কিছু?"

এইবার অরুণ বলিল–"হ্যাঁ–হপ্তায় একখানা করে রেজিস্ট্রি চিঠি আসে।"

আমি উৎসাহে লাফাইয়া উঠিলাম–"কোথেকে আসে? কে পাঠায়?"

লজ্জায় ঘাড় নীচু করিয়া অরুণ আস্তে আস্তে বলিল–"কলকাতা থেকেই আসে–রেবেকা লাইট নামে একজন স্ত্রীলোক পাঠায়।"

আমি বলিলাম–"হুঁ–বুঝেছি। চিঠিতে কি থাকে আপনারা দেখেছেন কি?"

"দেখেছি।" বলিয়া অরুণ মোহনের পানে তাকাইল।

আমি সাগ্রহে জিজ্ঞাসা করিলাম–"কি থাকে?"

"সাদা কাগজ।"

"সাদা কাগজ?"

"হ্যাঁ–খালি কতকগুলো সাদা কাগজ খামের মধ্যে পোরা থাকে–আর কিছু না।"

আমি হতবুদ্ধির মত প্রতিধ্বনি করিলাম–"আর কিছু না?"

"না।"

কিছুক্ষণ নির্বাক হইয়া তাকাইয়া রহিলাম; শেষে বলিলাম–"ঠিক জানেন খামের ভিতর আর কিছু থাকে না?"

অরুণ একটু হাসিয় বলিল–"ঠিক জানি। বাবা নিজে পিওনের সামনে রসিদ দস্তখত করে চিঠি নেন বটে কিন্তু আগে আমিই চিঠি খুলি। তাতে সাদা কাগজ ছাড়া আর কিছুই থাকে না।"

"প্রত্যেক বার আপনিই চিঠি খোলেন? কোথায় খোলেন?"

"বাবার ঘরে। সেইখানেই পিওন চিঠি নিয়ে যায় কিনা।"

"কিন্তু এ তো ভারি আশ্চর্য ব্যাপার! সাদা কাগজ রেজিস্ট্রি করে পাঠাবার মানে কি?"

মাথা নাড়িয়া অরুণ বলিল–"জানি না।"

আরো কিছুক্ষণ বোকার মত বসিয়া থাকিয়া শেষে একটা নিশ্বাস ফেলিয়া উঠিয়া পড়িলাম। রেজিস্ট্রি চিঠির কথা শুনিয়া মনে আশা হইয়াছিল, যে ফন্দিটা বুঝি ধরিয়া ফেলিয়াছি–কিন্তু না, ওদিকের দরজায় একেবারে তালা লাগানো। বুঝিলাম, আপাতদৃষ্টিতে ব্যাপার সামান্য ঠেকিলেও আমার বুদ্ধিতে কুলাইবে না। 'তুলা শুনিতে নরম কিন্তু ধুনিতে লবেজান।' ঐ বিষজর্জরিতদেহ অকালপঙ্গু বুড়া লম্পটকে আঁটিয়া ওঠা আমার কর্ম নয়–এখানে ব্যোমকেশের সেই শানিত ঝক্‌ঝকে মস্তিষ্কটি দরকার।

মলিন মুখে, ব্যোমকেশকে সকল কথা জানাইব বলিয়া বাহির হইতেছে, একটা কথা স্মরণ হইল। জিজ্ঞাসা করিলাম–"নন্দদুলালবাবু কাউকে চিঠিপত্র লেখেন?"

অরুণ বলিল–"না, তবে মাসে মাসে মানিঅর্ডার করে টাকা পাঠান।"

"কাকে পাঠান?"

লজ্জাম্লান মুখে অরুণ বলিল–"ঐ ইহুদি স্ত্রীলোকটাকে।"

মোহন ব্যাখ্যা করিয়া বলিল–"ঐ স্ত্রীলোকটা আগে নন্দদুলালবাবুর–"

"বুঝেছি। কত টাকা পাঠান?"

"এক শ টাকা। কিন্তু কেন পাঠান তা বলতে পারি না।"

মনে মনে ভাবিলাম–পেনশন। কিন্তু মুখে সে-কথা না বলিয়া একাকী বাহির হইয়া পড়িলাম। মোহন রহিয়া গেল।

মাকড়সার রস – ০৩

বাসায় পৌঁছতে রাত্রি আটটা বাজিল।

ব্যোমকেশ লাইব্রেরি ঘরে ছিল, দ্বারে ধাক্কা দিতেই কবাট খুলিয়া বলিল–“কি খবর? সমস্যা-ভঞ্জন হল?”

“না”–আমি ঘরে ঢুকিয়া একটা চেয়ারে বসিয়া পড়িলাম। ইতিপূর্বে ব্যোমকেশ একটা মোটা লেন্স লইয়া একখণ্ড কাগজ পরীক্ষা করিতেছিল, এখন আবার যন্ত্রটা তুলিয়া লইল। তারপর আমার দিকে একটা তীক্ষ্ণ দৃষ্টি হানিয়া বলিল–“ব্যাপার কি? এত শৌখিন হয়ে উঠলে কবে থেকে? আতর মেখেছ যে?”

“মাখিনি। নিয়ে এসেছি।” তাহাকে আদ্যোপান্ত সমস্ত বিবরণ বর্ণনা করিয়া শুনাইলাম, সে-ও বোধ হইল মন দিয়া শুনিল। উপসংহারে আমি বলিলাম–“আমার দ্বারা তো হল না ভাই–এখন দেখ, তুমি যদি কিছু পার। তবে আমার মনে হয়, এই আতরটা অ্যানালাইজ্ করলে কিছু পাওয়া যেতে পারে–”

“কি পাওয়া যাবে–মাকড়সার রস?” ব্যোমকেশ আমার হাত হইতে তুলাটা লইয়া তাহার আঘ্রাণ গ্রহণ করিয়া বলিল–“আঃ! চমৎকার গন্ধ! খাঁটি অম্বুরি আতর।” তুলাটা হাতের চামড়ার উপর ঘষিতে ঘষিতে বলিল–“হ্যাঁ–কি বলছিলে? কি পাওয়া যেতে পারে?”

একটু একটু ইতস্তত করিয়া বলিলাম–“হয়তো নন্দদুলালবাবু আতর মাখবার ছল করে–”

ব্যোমকেশ হাসিয়া উঠিল–“এক মাইল দূর থেকে যার গন্ধ পাওয়া যায় সে জিনিস কেউ লুকিয়ে ব্যবহার করতে পারে? নন্দদুলালবাবু যে আতর মাখেন তার কোনো প্রমাণ পেয়েছ?”

"তা পাইনি বটে–কিন্তু–"

"না হে না, ওদিকে নয়, অন্যদিকে সন্ধান কর। কি করে জিনিসটা ঘরের মধ্যে আসে, কি করে নন্দদুলালবাবু সকলের চোখের সামনে সেটা মুখে দেন–এইসব কথা ভেবে দেখ। রেজিস্ট্রে করে সাদা কাগজ কেন আসে? ঐ স্ত্রীলোকটাকে টাকা পাঠানো হয় কেন? ভেবে দেখেছ?"

আমি হতাশভাবে বলিলাম–"অনেক ভেবেছি, কিন্তু আমার দ্বারা হল না।"

"আরো ভাবো–কষ্ট না করলে কি কেষ্ট পাওয়া যায়?–গভীরভাবে ভাবো, একাগ্র চিত্তে ভাবো, নাছোড়বান্দা হয়ে ভাবো–" বলিয়া সে আবার লেন্সটা তুলিয়া লইল।

আমি জিজ্ঞাসা করিলাম–"আর তুমি?"

"আমিও ভাবছি। কিন্তু একাগ্রচিত্তে ভাবা বোধহয় হয়ে উঠবে না। আমার জালিয়াৎ–" বলিয়া সে টেবিলের উপর ঝুঁকিয়া পড়িল।

আমি ঘর হইতে উঠিয়া আসিয়া আমাদের বসিবার ঘরে আরাম-কেদারায় লম্বা হইয়া শুইয়া আবার ভাবিতে আরম্ভ করিলাম। সত্যই তো, কি এমন কঠিন কাজ যে আমি পারিব না। নিশ্চয় পারিব।

প্রথমত, রেজিস্ট্রি করিয়া সাদা কাগজ আসিবার সার্থকতা কি? অদৃশ্য কালি দিয়া তাহাতে কিছু লেখা থাকে? যদি তাই থাকে, তাহাতে নন্দদুলালবাবুর কি সুবিধা হয়? জিনিসটা তো তাঁহার কাছে পৌঁছিতে পারে না!

আচ্ছা, ধরিয়া লওয়া যাক, জিনিসটা কোনোক্রমে বাহির হইতে ঘরের ভিতর আসিয়া পৌঁছিল, কিন্তু সেটা নন্দদুলালবাবু রাখেন কোথায়? হোমিওপ্যাথিক ঔষধের শিশিও লুকাইয়া রাখা সহজ কথা নয়। অষ্টপ্রহর সতর্ক চক্ষু তাহাকে ঘিরিয়া আছে, তাহার উপর প্রত্যহ খানাতল্লাসী চলিতেছে। তবে?

ভাবিতে ভাবিতে মাথা গরম হইয়া উঠিল, পাঁচটা চুরুট পুড়িয়া ভস্মীভূত হইয়া গেল–কিন্তু একটা প্রশ্নেরও উত্তর পাইলাম না। নিরাশ হইয়া প্রায় হাল ছাড়িয়া দিয়াছি এমন সময় একটা অপূর্ব আইডিয়া মাথায় ধরিয়া গেল। ধড়মড় করিয়া আরাম কেদারায় উঠিয়া বসিলাম। এও কি সম্ভব! কিম্বা–সম্ভব নয়ই বা কেন? শুনিতে একটু অস্বাভাবিক ঠেকিলেও–এ ছাড়া আর কি হইতে পারে? ব্যোমকেশ বলিয়াছে, কোনো বিষয়ের যুক্তিসম্মত প্রমাণ যদি থাকে অথচ তাহা আপাতদৃষ্টিতে অসম্ভব বলিয়া মনে হয়, তবু তাহা সত্য বলিয়া ধরিতে হইবে। এক্ষেত্রেও ইহাই তো এ সমাধানের একমাত্র সমাধান। ব্যোমকেশকে বলিব মনে করিয়া উঠিয়া যাইতেছি, ব্যোমকেশ নিজেই আসিয়া প্রবেশ করিল; আমার মুখের দিকে চাহিয়া বলিল–"কি? ভেবে বার করলে না কি?"

"বোধহয় করেছি।"

"বেশ বেশ। কি বার করলে শুনি?"

বলিতে গিয়া একটু বাধ-বাধ ঠেকিতে লাগিল, তবু জোর করিয়া সঙ্কোচ সরাইয়া বলিলাম–"দেখ, নন্দদুলালবাবুর ঘরের দেওয়ালে কতকগুলো মাকড়সা দেখেছি, এখন মনে পড়িল। আমার বিশ্বাস তিনি সেইগুলোকে–"

"ধরে ধরে খান!"–ব্যোমকেশ হো হো করিয়া উচ্চরবে হাসিয়া উঠিল, "অজিত, তুমি একেবারে একটি–জিনিয়াস! তোমার জোড়া নেই। দেওয়ালের মাকড়সা ধরে ধরে খেলে নেশা হবে না ভাই, গা-ময় গরলের ঘা ফুটে বেরুবে। বুঝলে?"

আমি উত্তপ্ত হইয়া বলিলাম–"বেশ, তবে তুমিই বল।"

ব্যোমকেশ চেয়ারে বসিয়া টেবিলের উপর পা তুলিয়া দিল। অলসভাবে একটা চুরুট ধরাইতে ধরাইতে বলিল–"সাদা কাগজ ডাকে কেন আসে বুঝেছ?"

"না।"

"ইহুদি স্ত্রীলোকটাকে কেন টাকা পাঠানো হয় বুঝতে পেরেছ?"

"না।"

নন্দদুলালবাবু দিবারাত্রি অশ্লীল গল্প লেখেন কেন তাও বুঝতে পারনি?"

"না। তুমি বুঝেছ?"

"বোধহয় বুঝেছি," ব্যোমকেশ চুরুটে দীর্ঘ টান দিয়া নিমীলিত নেত্রে কহিল–"কিন্তু একটা বিষয়ে নিঃসন্দেহভাবে না-জানা পর্যন্ত মন্তব্য প্রকাশ করা সমীচীন হবে না।"

"কি বিষয়ে?"

ব্যোমকেশ মুদিতচক্ষে বলিল–"আগে জানা দরকার নন্দদুলালবাবুর জিভ কোন্ রঙের।"

মনে হইল ব্যোমকেশ আমাকে পরিহাস করিতেছে, রুষ্ট মুখে বলিলাম–"ঠাট্টা হচ্ছে বুঝি?"

"ঠাট্টা!" ব্যোমকেশ চোখ খুলিয়া আমাত্র মুখের ভাব দেখিয়া বলিল–"রাগ করলে? সত্যি বলছি ঠাট্টা নয়। নন্দদুলালবাবুর জিভের রঙের ওপরেই সব নির্ভর করছে। যদি তাঁর জিভের রঙ লাল হয়ে তাহলে বুঝব আমার অনুমান ঠিক, আর যদি না হয়–। তুমি বোধহয় লক্ষ্য করনি?"

আমি রাগ করিয়া বলিলাম–"না, জিভ লক্ষ্য করবার কথা আমার মনে হয়নি।"

ব্যোমকেশ সহাস্যে বলিল–"অথচ ঐটেই আগে মনে হওয়া উচিত ছিল। যা হোক, এক কাজ কর, ফোন করে নন্দদুলালবাবুর ছেলের কাছ থেকে খবর নাও।"

"রসিকতা করছি মনে করবে না তো?"

ব্যোমকেশ হাত নাড়িয়া কাব্যের ভাষায় বলিল–"ভয় নাই তোর ভয় নাই ওরে ভয় নাই–কিছু নাই তোর ভাবনা–"

পাশের ঘরে গিয়া নম্বর খুঁজিয়া ফোন করিলাম। মোহন তখনো সেখানে ছিল, সে-ই উত্তর দিল–"ও কথাটা দরকারি বলে মনে হয়নি, তাই বলিনি। নন্দদুলালবাবুর জিভের রঙ টকটকে লাল। একটু অস্বাভাবিক বলে মনে হয়, কারণ তিনি বেশি পান খান না। কেন বল দেখি?"

ব্যোমকেশকে ডাকিলাম, ব্যোমকেশ আসিয়া বলিল–"লাল তো? তবে আর কি–হয়ে গেছে।–দেখি।" আমার হাত হইতে ফোন লইয়া বলিল–"ডাক্তারবাবু? ভালই হল। আপনার ধাঁধার উত্তর পাওয়া গেছে। হ্যাঁ, অজিতই ভেবে বার করেছে–আমি একটু সাহায্য করেছি মাত্র। জালিয়াৎ নিয়ে ব্যস্ত ছিলুম তাই–হ্যাঁ, জালিয়াৎকে ধরেছি।...বিশেষ কিছু করতে হবে না, কেবল নন্দদুলালবাবুর ঘর থেকে লাল কালির দোয়াত আর লাল রঙের ফাউণ্টেন পেনটা সরিয়ে দেবেন।...হ্যাঁ–ঠিক ধরেছেন। কাল একবার আসবেন তখন সব কথা বলব...আচ্ছা, নমস্কার। অজিতকে আপনাদের পক্ষ থেকে ধন্যবাদ জানাবো। বলেছিলুম কিনা–যে ওর বুদ্ধি আজকাল ভীষণ ধারালো হয়ে উঠেছে?" হাসিতে হাসিতে ব্যোমকেশ ফোন রাখিয়া দিল।

বসিবার ঘরে ফিরিয়া আসিয়া লজ্জিত মুখে বলিলাম–"কতক-কতক যেন বুঝতে পারছি' কিন্তু তুমি সব কথা পরিষ্কার করে বল। কেমন করে বুঝলে?"

ঘড়ির দিকে একবার দৃষ্টিপাত করিয়া ব্যোমকেশ বলিল–"খাবার সময় হল, এখনি পুঁটিরাম ডাকতে আসবে। আচ্ছা, চটপট বলে নিচ্ছি শোনো।–প্রথম থেকেই তুমি ভুল পথে যাচ্ছিলে। দেখতে হবে জিনিসটা ঘরের মধ্যে প্রবেশ করে কি করে। তার নিজের হাত পা নেই, সুতরাং কেউ তাকে নিশ্চয়ই দিয়ে আসে। কে সে? ঘরের মধ্যে পাঁচজন লোক ঢুকতে পায়–ডাক্তার, দুই ছেলে, স্ত্রী এবং আর একজন। প্রথম চারজন বিষ খাওয়াবে না এটা নিশ্চিত, অতএব এ পঞ্চম ব্যক্তির কাজ।"

"পঞ্চম ব্যক্তি কে?"

"পঞ্চম ব্যক্তি হচ্ছে–পিওন। সে হপ্তায় একবার সই করবার জন্যে নন্দদুলালবাবুর ঘরে ঢোকে। সুতরাং তার মারফতেই জিনিসটা ঘরে প্রবেশ করে।"

"কিন্তু খামের মধ্যে তো সাদা কাগজ ছাড়া আর কিছু থাকে না।"

"ঐখানেই ফাঁকি। সবাই মনে করে খামের মধ্যে জিনিসটা আছে, তাই পিওনকে কেউ লক্ষ্য করে না। লোকটা হুঁশিয়ার, সে অনায়াসে লাল কালির দোয়াত বদলে দিয়ে চলে যায়। রেজিস্ট্রি করে সাদা কাগজ পাঠাবার উদ্দেশ্য হচ্ছে, কোনো ক্রমে পিওনকে নন্দদুলালবাবুর ঘরে ঢোকবার অবকাশ দেওয়া।"

"তারপর?"

"তুমি আর একটা ভুল করেছিলে; ইহুদি স্ত্রীলোকটাকে টাকা পাঠানো হয়–পেনশন স্বরূপ নয়, ও প্রথা কোথাও প্রচলিত নেই–টাকা ওষুধের দাম, ওই মাগীই পিওনের হাতে ওষুধ সরবরাহ করে।

"তাহলে দেখ, ওষুধ নন্দদুলালবাবুর হাতের কাছে এসে পৌঁছল, কেউ জানতে পারলে না। কিন্তু অষ্টপ্রহর ঘরে লোক থাকে, তিনি খাবেন কি করে? নন্দদুলালবাবু গল্প লিখতে আরম্ভ করলেন। সর্বদাই হাতের কাছে লেখার সরঞ্জাম রয়েছে, তাই উঠে গিয়ে খাবারও দরকার নেই–খাটের ওপর বসেই সে কার্য সম্পন্ন করা যায়। তিনি কালো কলম দিয়ে গল্প লিখছেন, লাল কলম দিয়ে তাতে দাগ দিচ্ছেন, ফাঁক পেলেই কলমের নিবটি চুষে নিচ্ছেন। কালি ফুরিয়ে গেলে আবার ফাউণ্টেন পেন ভরে নিচ্ছেন। জিভের রঙ লাল কেন এখন বুঝতে পারছে?"

"কিন্তু লালই যে হবে তা বুঝলে কি করে? কালোও তো হতে পারত?"

"হায় হায়, এটা বুঝলে না! কালো কালি যে বেশি খরচ হয়। নন্দদুলালবাবু ঐ অমূল্যনিধি কি বেশি খরচ হতে দিতে পারেন? তাই লাল কালির ব্যবস্থা।"

"বুঝেছি।–এত সহজ–"

"সহজ তো বটেই। কিন্তু যে-লোকের মাথা থেকে এই সহজ বুদ্ধি বেরিয়েছে তার মাথাটা অবহেলার বস্তু নয়। এত সহজ বলেই তোমরা ধরতে পারছিলে না।"

"তুমি ধরলে কি করে?"

"খুব সহজে। এই ব্যাপারে দুটো জিনিস সম্পূর্ণ নিরর্থক বলে মনে হয়–এক, রেজিস্ট্রি করে সাদা কাগজ আসা; দুই, নন্দদুলালবাবুর গল্প লেখা। এই দুটোর সত্যিকার কারণ খুঁজতে গিয়েই আসল কথাটি বেরিয়ে পড়ল।"

পাশের ঘরে ঝন্ ঝন্ করিয়া টেলিফোনের ঘণ্টি বাজিয়া উঠিল, আমরা দু'জনেই তাড়াতাড়ি উঠিয়া গেলাম। ব্যোমকেশ ফোন ধরিয়া জিজ্ঞাসা করিল–"কে আপনি? ও–ডাক্তারবাবু, কি খবর?...নন্দদুলালবাবু চেঁচামেচি করছেন?...হাত পা ছুড়ছেন? তা হোক, তা হোক, তাতে কোনো ক্ষতি হবে না।...অ্যাঁ! কি বলছেন? অজিতকে গালাগাল দিচ্ছেন? শকার বকার তুলে?...ভারি অন্যায়। ভারি অন্যায় কিন্তু–যখন তাঁর মুখ বন্ধ করা যাচ্ছে না তখন আর উপায় কি?...অজিত অবশ্য ওসব গ্রাহ্য করে না; অবিমিশ্র প্রশংসা যে পৃথিবীতে পাওয়া যায় না তা সে জানে। মধু ও হুল–কমলে কণ্টক...এই জগতের নিয়ম...আচ্ছা নমস্কার।"

(সমাপ্ত)